Rajshahi University journal of arts & law **ISSN 2309-0898 (Print)**
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 119-137 **ISSN 2408-8773 (Online)**
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0726

মাইলপোস্ট: দেশীয় বাস্তবতায় নিরীক্ষণ

[*Milepost*: Observation in the Context of National Reality]

ফাহমিদা সুলতানা তানজী*

Abstract

This article explores Milepost (1962–64), a landmark play by Sayeed Ahmad (1931–2010) that signals a distinctive turn in Bangladeshi dramaturgy. Departing from Beckettian impulses, Milepost is constructed through mechanisms embedded in the articulation of indigenous reality. While a "milepost" typically refers to a roadside marker indicating distance from a particular location, Ahmad's use of the term is metaphorically radical. In the play, the spatial limits of the titular milepost remain unknowable, mirroring the characters' uncertain trajectories and metaphysical disorientation—underscoring a profound existential crisis. Set against the backdrop of intensifying socio-cultural self-awareness, the article seeks to unravel the play's inner significance through a critical interrogation of dramaturgical forms that, while bearing European imprints, remain unbound by rigid formalism. There exists a significant dearth of research on Sayeed Ahmad's oeuvre, particularly within the Bangladeshi academic sphere. Yet, his dramaturgy imaginatively reconfigures the theatrical landscape of the Bengali imagination, planting seeds for scholarly inquiry. While Milepost resists conventional realism, its aesthetic legitimacy remains unassailable. The play's abstract layering—situating an inanimate object at the narrative center—compels both spectators and scholars toward deeper hermeneutical engagement. Anchored in the political and social matrix of pre-liberation Bangladesh, this study investigates how an object can be foregrounded as the protagonist within dramatic structure. Through a methodologically hybrid approach—combining positional neutrality with empirical observation—the essay endeavors to decode the dramaturgical and philosophical mechanics at play. Ultimately, it will argue that Milepost: Observing in Native Reality emerges as a cultural and historical vessel: a theatrical embodiment capable of reflecting the complexity and spirit of Bangladesh's lived experience.

Keywords: Milepost, Sayeed Ahmad, Value of art, Native history, Culture.

ভূমিকা

নাট্যকার সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) *মাইলপোস্ট* নাটকটি ১৯৬২-৬৪ সালে রচিত হয়েছে। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় পরবর্তীতে আসকার ইবনে শাইখের অনুপ্রেরণায় নাট্যকার সাঈদ বাংলায় তর্জমা করতে রাজি হলে তাঁর বন্ধু নাট্যজন আতাউর রাহমান বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদের ভিত্তিতে নাট্যকার সাঈদ নাটকটির 'আগাগোড়া পরিমার্জনা'[১] করেন বাংলা ভাষাতেই। মাইলপোস্ট অর্থাৎ যা পথের সীমানা চিহ্নায়নকারী জীবনের নিশ্চয়তাকে ভেঙে দেয়, এমন কোন বস্তুকে নাট্যকার সাঈদ প্রধান চরিত্র করে রচনা করেছেন এই কালজয়ী নাটকটি। তিনি নৃতাত্ত্বিক ব্রুনো লাতুরের মতো জীব-জড় সকল কিছুর মধ্যে অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন বলে, '৭১ পূর্ববর্তী সময়ে তিনি এমন অত্যাধুনিক নাটক রচনা করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি ২০২৫ সালেও অনেকের কাছে বাস্তব বলে বোধ না হওয়াও অবাস্তব নয়। তিনি জীবনের সীমিতকরণ

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৪৩৩১, বাংলাদেশ;
E-mail: fahmida.tanjee@gmail.com

নয় বরং অসীম পৃথিবীতে যৌক্তিকভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আর এই পরিত্রাণের কথা তিনি সমগ্র নাটক জুড়ে নিম্নবর্গীয় কিছু চরিত্রের মাধ্যমে উচ্চারণ করিয়েছেন। নাটকটি ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাতরং সৌখিন নাট্যসংস্থা প্রযোজনারূপে বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার সাঈদ সতন্ত্র অ্যাবসার্ড দর্শন ও বাস্তববাদকে পরিহার করলেও বাস্তববাদকে পরিহার করেনি। যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাট্যকার করেছিলেন '৬২তে, তা রক্তস্নানের মাধ্যমে এসেছিলো '৭১-এ। পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বাঙালি জাতির মাঝে আজও বিদ্যমান। বাংলার জনগণ এখনও ক্ষুধামুক্ত নয়, প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সমাজে বিন্যস্ত প্রায় প্রতিটি পদে, প্রতিটি স্তরে অবিন্যস্ততা, বিশৃঙ্খলা ; যা নিরোসনের লক্ষ্যে এদেশবাসীকে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। মূলত এই সকল তথ্যের তত্ত্ব তালাশ নাট্যকার সাঈদ পূর্বেই তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ছায়ার তলে অত্যন্ত গোপণে করতে চেয়েছিলেন, অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। অ্যাবসার্ডের প্লটকে উপজীব্য করে, মাত্র সাতটি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি বাংলার বাস্তবিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। বাংলায় পরিত্রাণের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ, যদিও মুক্তির সম্ভাবনায় বাংলার মাকে আহ্বান করতে শোনা গিয়েছিলো'৭১ পূর্ববর্তী সময়ে এবং বর্তমান বাংলাদেশে একই সুর আজও ধ্বণিত হচ্ছে রাস্তার অলিতে-গলিতে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তথ্য উপাত্ত সহযোগে প্রমাণের প্রয়াস চালাবে শিল্পের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে থিয়েটারের ভাষায় সমাজের সত্যকে উন্মোচনের পথকে। আপাত অর্থে নাট্যকার সাঈদ সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য নন। শিল্পের উদার নৈতিকতায় নাট্যকার সাঈদকে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলে তৈরি হবে শিল্পের নব্যবয়ান, যেখানে দেশের জনগণ পাবে করণীয় কাজের ইঙ্গিত।

মাইলপোস্টে'র ঐতিহাসিক বাস্তবতা

'বাঙালির ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালি বাঁচিবে না'[২]। মূলত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কারণে বাঙালির ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। চতুর্মুখী আক্রমণে বাঙালি তার পূর্বের কথা রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। অবশ্য আজকের দিনে বাঙালি কোণঠাসা অন্ধকার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বাঙালি জনগণের মন ঐতিহাসিক সত্য গ্রহণে প্রস্তুত। বলা যায়, 'মানুষই মানুষের ইতিহাস এবং মানুষই মানুষের ইতিহাসের নির্মাতা'[৩]। ইতিহাসে প্রতিটা জাতি তাদের পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ এই পৃথিবীর মানুষের ভগ্নাংশ। সুতরাং বিশ্বমানবতার অগ্রগতি আর আত্মিক সম্পদের অধিকারী হিসেবে এদেশের মানুষকে পেছনে ফেলা সম্ভব নয়। আবেগের অতিশয্যে বাংলার মানুষকে আদিবৃক্ষের মতো বিচার করা ঐতিহাসিক সংকীর্ণতার পরিচায়ক। আবার বিদেশী জাতির আরোপিত ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতিকে বয়ে বেড়ানো নির্বোধ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করাও সংকীর্ণতার পরিচায়ক। বাঙালির ইতিহাস কখনই সহজ, সরল, নির্মল ছিলো না। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'বাঙালি গড়ে ওঠেনি, ঢালাই হয়েছে'[৪]। প্রমথ চৌধুরী বাঙালির কোন অংশের ঢালাই হবার বক্তব্য তুলে ধরেছেন, তা তিনি স্পষ্ট না করলেও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধরে নেয়া যায়, 'বিভিন্ন সময়ে রাজশক্তির আনুকূল্য করেছে যে সকল শ্রেণী তারাই ঢালাই হয়েছে'[৫]। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশের মানুষের গায়ে এই কথার আঁচড়ও লাগেনি। যদিও ছাত্রসমাজের হাত ধরে পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। অস্থিতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক মধ্যদিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল থেকে বর্তমান বাংলাদেশ। বাঙালির সুন্দরভাবে বাঁচার আশা কেবল নতুন কিছুর জন্য নয় ; যা কিছু শুভ তার জন্য।

ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢালাই হওয়া মানুষেরাই কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতিতে লাবণ্যের সঞ্চার করেছেন। একসময়ে বাঙালি নিজ থেকে মনের বিস্তৃতি করেছে, বাংলার ইতিহাসও লিখেছে। ফলত, নাট্যকার সাঈদের মতো ঢালাই হওয়া বাঙালি স্থানীয় রুচি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য দিয়ে সমাজের চলিষ্ণুতাকে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাসকে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ করতে পেরেছে। এইস্থানে অগ্রগামী হয়ে নাট্যকার সাঈদ দেখিয়েছেন, মানুষের বেঁচে থাকা কেবল বর্তমানের যোগফল নয় বরং তা অতীত ও ভবিষ্যতেরও

যোগফল। ভবিষ্যত নিয়ে বাস্তব পরিকল্পনা না থাকলে অতীতের রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। 'কেননা প্রকৃত অতীতের উপরই সত্যিকারের ভবিষ্যতের ভিত্তি'[৬]। ইতিহাসের আসল উপাদান মানুষ, তা অনেক ঐতিহাসিকের রচনা থেকে বাদ পরলেও নাট্যকার সাঈদ আহমদের কাছে মানুষই ছিলো প্রধান। এজন্য অবশ্য ঐতিহাসিকগণের দোষ খুব একটা দেয়া যায় না। কারণ সমাজের প্রধান উপাদান তো মানুষ, তারা যদি না এগোয় তবে ঐতিহাসিকগণ 'ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে পারেন না'[৭] আর এসকল কারণে বাঙালি এখনও কেবল স্বপ্ন দেখে, তা বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তাদের খুব কম।

'৪৭ বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসকে লেখার সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছে। কেননা তখন থেকে বাঙালি নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে, যা '৭১ আরও তরান্বিত করেছে। চরিত্রের যা কিছু মহৎ, শ্রেষ্ঠ ও সত্য তার ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে বাঙালি; ২০২৪-এ হয়েছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। '৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা যে পোকায় খাওয়া মানচিত্র ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে উপহার পায়, তার ফলাফল '৭১ এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ২০২৪ এর জেন জেড এবং সর্বস্তরের বাংলাদেশের মানুষের জেগে ওঠা।

চিত্র : ১

তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষকে দাস করে রাখার জন্য জঙ্গলের আইন জারি করে, যা নাট্যকার সাঈদ তাঁর তৃতীয় নাটক *তৃষ্ণায়*'র মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। ২৫ মার্চ রাতের অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষকে খাঁচায় আটকে রাখার জন্য নৃশংস বন্য আইন জারি করে। বস্তুত '৭১ এর সংগ্রাম ছিলো ডাইনোসরের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রাম, স্বাধীনতাকামী মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। ফলে, বাঙালি নতুন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে প্রতিনিয়ত। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাঙালি প্রতিনিয়ত প্রমিথিয়ান আগুনের তাপে দগ্ধ হয়েছে। নারকীয় যন্ত্রনা আর পৈশাচিক নির্যাতনের মধ্যদিয়ে ৮ ফাল্গুন বাংলাকে সর্বস্তরের মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করে। বাহান্ন থেকে বাহাত্তর এজাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষের রক্তসূত্রটি মানুষের ধমনীর সাথে মিশেছে।'৫২ ছিলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তিমূল। কঠোর প্রতিরোধের ফলে পাকিস্তানি আমলে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি মেলে। পাকিস্তানি আমলে বাংলা ভাষা কখনও গণতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। পাকিস্তানি আমলে তাই বাংলা ভাষা মূলহীন ডালপালা সর্বস্ব রাষ্ট্রভাষা ছিলো।

নাট্যকার সাঈদের মাইলপোস্ট নাটকের প্লটে বিধৌত সূর্যাস্ত হতে সূর্যাস্ত সময় পর্যন্ত কালকে দুর্ভিক্ষ হতে পরিত্রাণের অসম্ভবতা জনিত নৈরাশ্যের কারণে নৈতিক সংকট, এমনটাই নাট্যকার সাঈদ বিবৃত করেছেন তাঁর নাটকে। এহেন উভয়সংকটে নিপতিত বাঙালির মুক্তির যাত্রাপথের এক কাঠামো নির্ধারণ করেছেন নাট্যকার। এই দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে ক্ষুধা লক্ষ্য করা যায়, তার থেকে মুক্তির আশা অলৌকিক বলে মনে করেন নাট্যকার। যদি তৎকালীন সময়ের দুর্ভিক্ষের ইতিহাসকে অনুরণণ, অর্থহীনতা কিংবা অসঙ্গতির মধ্যদিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকের প্রথম অংশের মিমাংশা হতে পারে। ১৯৪০-১৯৫০ এই সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামন্তবাদী ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলো। এরমধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপরীত ভাবাদর্শ। পৃথিবীর তাবৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গাটি ভিন্ন। ধরণীর

অন্যান্য অংশে মধ্যবিত্ত বলতে উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তের মধ্যবর্তী শ্রেণিকে বোঝালেও বাঙালিদের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হচ্ছে বৃটিশ শাসকের অনুকূলে চাকরী করা, মোটামুটি ইংরেজি শিক্ষিত একটি শ্রেণি। তাদের মধ্যেই '৪৮ থেকে '৫০-এর মধ্যে তেভাগা, নানকার, টঙ্ক, নাচোল প্রভৃতি বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এগুলোর কোনটির মাধ্যমে পারফরমেন্সের খোরাক জাগাতে বাঙালি পারেনি। এরকম বাস্তব ও থিয়েটার উভয় ক্ষেত্রে যখন শোসণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের রূপায়ণ থেকে বাঙালি ভুগছিলো, তখন ১৯৬৫ সাল নাগাদ মাইলপোস্ট বাংলা একাডেমীতে মঞ্চায়িত হয়। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭৯ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত নাট্যকার সাঈদ আহমদের প্রযোজনা উপাত্ত সম্পর্কে জামিল আহমেদ বলেছেন, 'জনগণ যদি তাদের জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকে তবুও স্যালভেশন বা পরিত্রাণ অসম্ভব কিনা এই সংশয়ে ভোগে নাটকটি'[৮]। প্রফেসর সৈয়দ জামিল নাট্যকার সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটককে মেটাকমেন্টারি বা মহাভাষ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং একইসাথে নাটকটিকে তিনি ১৯৬৯-এর নিরিখে ভুল বলে মূল্যায়ন করেছেন। এখানেই আসে পরিত্রাণের প্রসঙ্গ।

নাটকটি যেহেতু বেকেটীয় ধমনী থেকে নির্গত তাই প্রথমে খ্রিষ্টানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে শব্দটির অর্থ উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালানো হবে এবং একইসাথে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ হবে। খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হয়, কেউ যদি মুখে ও অন্তরে বিশ্বাস করে যে যীশুকে প্রভু এবং ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন; তবে পরিত্রাণ সম্ভব। শব্দটি আধ্যাত্মিকতার সাথে জড়িত। এখানে বস্তুগত সংরক্ষণ, বিপদের ভয় থেকে মুক্তির পাশাপাশি ক্ষমা, পুনরুদ্ধার, নিরাময়, আত্মা ও দেহের সম্পূর্ণতা ও সুস্থতা বোঝায়। বিষয়টি মন্দ থেকে ভালোর দিকে যাত্রা করে ও শাশ্বত। যেহেতু এটি পাপের আধিপত্য থেকে মুক্তি দেয়, তাই এটি জীবনের সাথে সম্পর্কিত। গীতসংহিতা ৯১ বলে, মানুষ মহামারী থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে, যার মধ্যে আছে অসুস্থতা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপর্যয়। পরমেশ্বর গোপণ স্থানে বাস করেন ও তিনি সর্বশক্তিমানের ছায়ায় স্থির থাকেন। যীশু গেথসেমানের বাগানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর অনুসারীদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছিলেন। এবার নাট্যকার সাঈদ আহমদের পরিত্রাণের সম্পর্কিত অন্বেষণ করতে হলে '৪৭ পরবর্তী বাঙালি জীবনকে বিশ্লেষণ করতে হবে। নাট্যকার সাঈদ আহমদ মাত্র সাতটি চরিত্রের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষে পতিত হওয়া ও পরিত্রাণের অন্বেষণ করেছেন। দুর্ভিক্ষ হচ্ছে একইসাথে অনেক মানুষের মৃত্যু বরণ করার প্রধান কার এবং এতে মানুষের ঠাঁইও বদল হয়। শব্দটি দেশের রাজনীতির সাথে যুক্ত। বাংলায় ইংরেজ শাসন শুরু হলে ১৭৭০ সালে , বাংলা ১১৭৬ সালে নেমে এসেছিলো ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ। যাকে ইতিহাস ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে। এই মন্বন্তরে মারা যায় প্রায় এককোটি মানুষ। দুই বাংলার মোট জনগোষ্ঠীর তিনভাগের একভাগ খেতে না পেয়ে মারা যায়।

চিত্র : ২

দুর্ভিক্ষের কারণ ব্রিটিশ শাসকদের রাজস্বনীতি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী খাজনার পরিমাণ ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করে ১৭৬৯ দেখা দেয় ভয়াবহ বন্যা। অতিরিক্ত খাজনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেই সময়ে। ব্রিটিশদের শাসনামলে বাঙালি আরেকবার ভয়াবহ মন্বন্তরের সম্মুখীন হয়। সরদার ফজলুল করিমের *আমি সরদার বলছি* বইটিতে এর সূক্ষ্ম বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সাল, বাংলা ১৩৫০ সাল। এই সময়টি বাঙালিকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে।

চিত্র : ৩

ব্রিটিশ সরকার তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। ভারতে তৎকালীন সময়ে চাল আমদানী হতো মিয়ানমার থেকে। জাপান মিয়ানমার দখল করলে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। ২০ থেকে ৫০ লাখ মানুষ তখন না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিলো। তেতাল্লিশের মন্বন্তর নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, দুর্ভিক্ষ কেবল খাদ্যের অভাবের কারণে হয় না বরং খাদ্যের সুষম বন্টনও এর জন্য দায়ী। যেহেতু প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের খাবার কেনার সামর্থ্য ছিলো না তাই লাখ লাখ মানুষকে সেই সময়ে না খেতে পেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছিলো। নাট্যকার সাঈদের নাটকের মুখ্য চরিত্র মুলত এই ১৯৪৩ এর মন্বন্তর। '৪৩ এর মন্বন্তরে ধুঁকছে দেশ, ধুঁকছে বাংলা মা। এই মা কোন রূপকথার জাদুতে পরিপুষ্ট সুন্দরী রমনী নয়। যাকে দেখলে স্বপ্নে দেশে বিচরণের কথা মনে পড়ে। এই মা দেশের সাত কোটি সন্তানের অন্ন যোগাতে ব্যর্থ হওয়া জীর্ণ-শীর্ণ মা। এই মা-ও পরিত্রাণ আনতে চেয়েছিলো। গল্পটি মুসলিম সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি ও মুক্তির সাথে জড়িত। ইসলামে হাবিল প্রথম মানুষ যে পশু কোরবানী করেছিলো। হাবিল একটা ভেড়া ও তাঁর ভাই কাবিল উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। তৎকালে আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি ছিলো, আগুন আকাশ থেকে নেমে আসবে এবং গ্রহণযোগ্য কোরবানী গ্রহণ করবে। তদানুসারে আগুন নেমে আসে ও হাবিলের ভেড়াটি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কাবিলের ফসলকে প্রত্যাখ্যান করে। সেই সময় কাবিল হাবিলের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে এবং মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ড চালায়। সে অনুতপ্ত না হওয়াতে আল্লাহ কাবিলকে ক্ষমা করেননি। পরবর্তীতে বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ ইব্রাহিম (আঃ) - কে স্বপ্নযোগে তাঁর প্রিয় বস্তু কোরবাণী করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি ১০টি উট কোরবাণী করলেন। পুনরায় তিনি একই স্বপ্ন দেখেন ও পুনরায় ১০টি উট কোরবানী দেন। এরপর তিনি আবার একই স্বপ্ন দেখলে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর কাছে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ভিন্ন প্রিয় কেউ নেই। তিনি স্বীয় পুত্রকে কোরবানী করার উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে নিয়ে গেলেন ও পুত্রের পরিবর্তে দুম্বার কোরবানী হয়, তাঁর পুত্রের কোন ক্ষতি ছাড়া। আল কুরআনের সুরা বাকারা, মায়েদা, আনআমে, হজ, সাফফাত, কাওসারে কুরবানী সম্পর্কিত তথ্য আছে। যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

কথাই মূল কথা। মুসলিম সম্প্রদায় পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কোরবানী দেয়, যা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত। পরিত্রাণ সম্ভব কিনা বিষয়টিতে ২০২৫'র বাঙালিও শঙ্কিত। তবে তারা আশাবাদী। যে হাবিল কাবিলের দ্বারা ইতিহাসের হত্যাকাণ্ডজনিত ঘটনার সূচনা হয়েছিলো বর্তমান বাংলাদেশ দেখল তার পুররাবৃত্তি। তবু যেন থামছেনা অরাজকতা, শঙ্কা। হেগেলীয়ান দ্বান্দ্বিকতা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেকেটের ছাঁচ থেকে প্রস্থান করে নাট্যকার সাঈদ বাংলার ঐতিহ্য থেকে দুটি নারী-চরিত্র সংগ্রহ করেন। এরা হলেন, মা ফাতিমা ও কালী। তাদের চরিত্রের সংমিশ্রণে নিঃস্বার্থ, সদা দানশীল, প্রতিপালনকারী গুণাবলীর সম্মিলনে মায়ের চরিত্র নাট্যকার সাঈদ যথার্থই এঁকেছেন। এই মা স্যালভেশনের বা পরিত্রাণের আশায় উদগ্রীব। সে স্বপ্ন সহযোগে দেখে একজন দিব্য পুরুষ বলছেন-

> মা : তুমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তোমার ছেলেকে উৎসর্গ করবে। .. একটা বড় ছোরা দিয়ে তোমার ছেলেকে কোরবানী করো। ফিনকি দিয়ে উছলে পড়া রক্ত লাখো লাখো মানুষের পাপকে ধুয়ে দেবে। একজনের ত্যাগে ঋণ শোধ হবে হাজারো মানুষের-মুক্ত হবে ওরা[৯]

নাট্যকার সাঈদ পিতৃতান্ত্রিক ইব্রাহিম (আঃ) এর স্থলে মাতৃতন্ত্রকে উপস্থাপন করেন। পুরো বিষয়টি তিনি করেছেন ইসলামি পরম্পরায়। ফাতেমা ও কালীর মিশ্রণে তিনি যে কোমল ও তাণ্ডবপূর্ণ দেশের চিত্র মা চরিত্রটির মাধ্যমে করেছেন তাতে দেশের জন্য উদ্বেগই মূখ্য স্থান লাভ করেছে। উল্লেখ্য মাতৃতন্ত্র স্থাপন করে নাট্যকার সাঈদ অ্যাবসার্ডের পথ পরিত্যাগ করেন। এইখানে নাট্যকার ভিন্ন কাহিনিসূত্রের অবতারণা করেন। জন্ম নেয় ভিন্ন কাহিনির। তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে পাঠক জানতে পারে মায়ের দুই ছেলে ইব্রাহিম (আঃ) এর পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর আদর্শ অনুসরণ না করে পলায়ন করে তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগে। ম্লাণমুখে ভাতৃদ্বয়ের প্রত্যাবর্তন ঘটে। ঠেলাগাড়ি থেকে ছুরি এনে মায়ের হাতে দিয়ে বলে তারা কোরবানীর জন্য প্রস্তুত। ধর্মের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে চাওয়া নৈতিকভাবে সমর্থিত এবং বাস্তবসম্মত। একইসাথে জীবনকে ভালবেসে পিছিয়ে আসাও বাস্তবতা বহির্ভূত কাজ নয়। ঈশ্বরের কর্মকাণ্ডে সন্দেহ পোষণ করে সঙ চরিত্রটি।

> সঙ : ঠিক, আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছি। কিন্তু একজন পুণ্যাত্মা পুরুষ কিভাবে একটি জীবন কোরবানী করতে বলেন, আর সেটাও মানুষের?[১০]

চৌকিদার এগিয়ে আসে ও মানবের প্রাচীন বিশ্বাসের কথা বলে। প্রাচীন চিন্তার সাথে এখন অনেক কিছু বদলে গেছে বিষয়টা উল্লেখ করতে সে ভোলে না। বড় ভাই, ছোট ভাই দুজনেই জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত। এখানেও সঙ চরিত্রটি মায়ের মনে সংশয় তৈরি করে দেয়। একজন মায়ের কাছে কোন সন্তান বেশি প্রিয় এই সংক্রান্ত কথা সত্যি মাকে সিদ্ধান্তহীনতায় ফেলে দেয়। এযেন বাংলাদেশে কিংবা সমগ্র পৃথিবীতে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির নকল অথবা বর্তমান বাংলাদেশেই নাট্যকার সাঈদের লেখনীর নকল। বরাবরই চেতনার কথা বলে যথার্থ কথা বলতে দ্বিধায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে বাঙালিকে। বাংলাদেশিগণ দ্বিধায় ভুগে যুক্তি আর দেশপ্রেমজাতীয় দ্বন্দ্বে।

> সঙ : লক্ষ বছর আগে ছেলে ছিল একটি। আপনার ছেলে দুটি। এরমধ্যে কে বেশী প্রিয়? কাকে আপনি উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন? স্বপ্নে দরবেশ তো আপনাকে কোন নির্দিষ্ট নাম বলেননি।[১১]

মা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। মাতৃত্বের কাছে পরিত্রাণ ফিকে হয়ে আসে। আর এখানেই নাট্যকার সাঈদ বেকেটীয় ধমনী থেকে বের হয়ে এসেছেন।

> মা : এস, বাছারা আমার কাছে বস, আমাকে তোমাদের মুখ দেখতে দাও।[১২]

দেশের পরিত্রাণ আসলেই সম্ভব কিনা এমন সংশয় নাট্যকার সাঈদেরও ছিলো। নাটকটি যুদ্ধের আগে লেখা। তাই যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে সবটা আন্দাজ করাটা দুঃসাধ্যও বটে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, *মাইলপোস্টে*'র নিহিত আছে '৪৩-এর মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষ ছিলো মনুষ্যসৃষ্টি। '৪২-এরদিকে এদেশে খাদ্যের চরম সংকট দেখা দিয়েছিলো। সেই সংকট মোকাবিলা করার সামর্থ্য ফজলুল হক মন্ত্রিসভার ছিলো না। এজন্য তিনি ১৯৪৩ এ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর খাজা নাজিম উদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিনের মধ্যেই মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের জন্য মুসলিম লীগ ও ভারত সরকার উভয়েই কমবেশি দায়ী ছিলো। দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ রাজনৈতিক দলসমূহের অবহেলা। দ্বিতীয় কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাপানিদের প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশের যোগাযোগব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়, খাদ্যদ্রব্য মজুত করে কেবল সৈন্যদের জন্য ব্যয় করে। এসময়ে কডিং প্রথা চালু করা হয়। এ সময়ে যানবাহন ও খাদ্যের গাড়ি চলাচলে ব্যাপক বাঁধার সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাব সরকার খাদ্য পাঠাতে চাইলেও কডিং প্রথার জন্য পারেনি। ১৯৩৮ থেকে শস্য-উৎপাদনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। যা দুর্ভিক্ষের আরেকটি কারণ। খাজা নাজিম উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী সরকারের খাদ্যমন্ত্রি ছিলেন। তিনি খাদ্য ঘাটতির জন্য ব্যবস্থা না নিয়ে বরং খাদ্যসামগ্রী অন্য প্রদেশ থেকে আনতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া সাহায্য করতে চাইলেও ব্রিটিশ সরকার তা গ্রহণ করেনি। এই সময়ে রোগব্যাধির প্রকপ বেড়ে যায়, মানুষ দেশান্তরি হতে থাকে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও প্রকৃতি প্রদত্ত অনাবৃষ্টি ছিলো আরেকটি কারণ। বর্তমান বাংলাদেশেও দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে, তা নিস্বন্দেহে মনুষ্যসৃষ্ট। ২০২৪ এর বাংলাদেশে একটি ছাগলের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয় পনেরো লক্ষ টাকা। যার নজির দেশবাসী কোনোকালে দেখেনি। ডলারের সংকট দেশবাসীর ভোগান্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বাজার মূল্য নির্ধারণ করেছে নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট। ফলে, একটি শ্রেণির কাছে প্রচুর অর্থ এসে পড়ে আর অন্য শ্রেণি অব্যক্ত বেদনা নিয়ে স্বসম্মানে নিরবে চাহিদা কমিয়ে দিনাতিপাত করেছে। বিরোধীতা করলে হয়রানি, খুন, গুম কিংবা ঠিকানা হয়েছে আয়নাঘর।

নাট্যকার সাঈদ স্পষ্টতই দুর্ভিক্ষকবলিত পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতার ওপর *মাইলপোস্ট* নাটকের প্লট গঠন করেছেন। আর এই বাস্তবতার ওপর ভর করে এগিয়ে যাবার কারণে তাঁকে অবধারিকভাবে অ্যাবসার্ডরীতি থেকে সরে আসতে হয়েছিলো। অ্যাবসার্ডের প্রতি আনুগত্য ক্ষুণ্ন হলেও তিনি ভিনদেশি রীতির সংমিশ্রণ করেছিলেন অত্যন্ত নান্দনিকভাবে। অ্যাবসার্ডরীতি থেকে সরে আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে, দৈনন্দিন জীবন থেকে উপলব্ধি করা সত্যের চেয়েও তীক্ষ্ণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্যকে তিনি দেখেছিলেন। যা তিনি নির্বাচন ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন।

> প্রচলিত যুক্তি ও একরৈখিক ধারণাসঙ্গত চিন্তনের প্রতি আক্রমণ পরিচালনার অর্থ এই নয় যে অ্যাবসার্ড নাট্যকলা সকল প্রকার অর্থ নির্মাণের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে বরং এই প্রত্যাখ্যান অর্থের গভীরতর পরত প্রবিষ্টের প্রতি ধাবিত এক আন্তরিক প্রচেষ্টা, এবং বাস্তবের অধিকতর জটিল হেতু অধিকতর সত্য প্রতিকৃতি উপস্থাপনে যত্নশীল- যে প্রতিকৃতি সকল অনুরনন বিবর্জিত সরলীকরণ এবং মানব পরিস্থিতির সহজাত অর্থহীনতা।[১৩]

এসলিনের বক্তব্য সূত্র ধরে বলা যায়, সাঈদ ইবসেনীয় যুক্তি ও একরৈখিক চিন্তাকে বর্জন করেছেন বলে এই নয় তিনি অ্যাবসার্ডের সকল স্বত্ব নিয়ে নাটক নির্মাণের অভিপ্রায়কে বর্জন করেছেন। বরং আলোচ্য নাটকে নিহিত রয়েছে অ্যাবসার্ডীয় চেতনা, যা তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে চৌকিদার সূর্যাস্তের কিছু আগে রাজপথে আসে। সে মাইলপোস্টটিকে সোজা করে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে চালাতে সফল হন, যা নাটকটির পরবর্তী

গন্তব্যের ইঙ্গিত। প্রথম সংলাপের পর তার সাথে পরিচয় হয় বস্তা কাঁধে এক ব্যক্তির সাথে। সে অত্র অঞ্চলের চৌকিদার। শুরুতেই দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার।

> চৌকিদার : তোমার বস্তার মধ্যে কি আছে ?
> গোরখোদক : খাবার জিনিস।
> চৌকিদার : হতেই পারে না, আমি জানি ওটা এখন দুষ্প্রাপ্য।[১৪]

মুলত, দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষের হাড় সহজে পাওয়া যায়। এটি ব্যবসার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলে মুনাফা বেশ ভালো আসে, যা এখনও প্রযোজ্য। গোরখোদক জানে মানুষ আর সরলতা এক পথে চলে না। তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে ভিন্নধর্মী কায়দার আশ্রয় নিতে হয়েছে, যেমনটা অনেককেই নিতে হয়। কিন্তু গতকালের গোরখোদক আর সে এক ব্যক্তি নয়। গতকারের গোরখোদক মরে গেছে। ডারউইনের তত্ত্বের মর্ম সে বোঝেনি। পূর্বেই বলা হয়েছে, মানুষ আর সরলতা এক পথে চলে না। সময়টা এতটাই প্রতিকূল যে কারও জন্য শোক পালন করে স্থির হয়ে পনেরো মিনিট বসে থাকার উপায় নাই।

> গোরখোদক : .. এমনি করে যদি প্রতিটি মৃত অথবা মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য কয়েক মুহূর্তের নীরবতা পালন করতে থাক, তবে দুনিয়াটা এক্কেবারে সুমসাম হয়ে পড়বে।[১৫]

নাট্যকার সাঈদ যে বিরানভূমি চিড়ে মাইলপোস্ট স্থাপন করেছেন, তাতে চৌকিদার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

> চৌকিদার : এ রাস্তার মানুষকে আমি হাসতে দেখেছি, দেখেছি রাস্তার উপরে কেউ খাচ্ছে, কেউবা নাচছে, কেউবা প্রেম প্রেম খেলছে। দেখেছি কালো কালো কাকগুলো রাজপথে পরিত্যক্ত পচা লাশ ঠুকরে ঠকরে খাচ্ছে[১৬]

স্পষ্টতই দুর্ভিক্ষের এই করাল চিত্র '৪৩-এর মন্বন্তরের। বাঙলা ১১৭৬ থেকে ১৩৫০ সাল। মাত্র ১৭৪ বছরের ব্যবধান। বলা হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর পটভূমিতে সৃষ্টি করেছেন *অশনি সংকেত*। ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরে হোসেন শহদি সোহরাওয়ার্দী বেঙ্গল লেজিসটেটিভ অ্যাসেম্বলিতে মন্বন্তরের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, প্রাকৃতিক ও সামরিক কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ডঃ অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের বছর থেকে বিগত কয়েক বছরের জনসংখ্যা ও শস্যোৎপাদনের হার বিশ্লেষণ করে বলেছেন ১৯৪৩ সালে বিগত বছরগুলোর তুলনায় খাদ্য সরবরাহ পাঁচ শতাংশ কম ছিলো। তিনি এই মন্বন্তরকে মুদ্রাস্ফীতি জনিত মন্বন্তর বলে মনে করেন। যুদ্ধেও সময় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সরকারকে তাই প্রয়োজনমতো নোট ছাপিয়ে ব্যয়ভার সামাল দিতে হয়েছিলো। এমতাবস্থায় মজুতদারো খাদ্যদ্রব্য মজুত করে অধিক মুনাফায় বিক্রি করে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সেই অনুপাতে কৃষক-শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে উদাসীন ছিলো। '৪৩-এর মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মৃত্যু হার বেড়ে যায়। নভেম্বরের পর কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিলো। এর মাঝে চলতে থাকে আরেক শ্রেণির লুণ্ঠন প্রক্রিয়া। ভাতের অন্বেষণে দলে দলে লোক পথে নেমে পড়ে। হাজার হাজার ভিখারিতে শহর ভরে যায় দলে দলে মানুষ মরতে থাকে। এত মৃতদেহ অপসারণের কাজ চ্যালেঞ্জের মতো ছিলো। শেষের দিকে সরকার খাদ্য সরবরাহ শুরু করলেও ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। সরকারি নীতি অনুযায়ী শিল্পাঞ্চল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী পাবে। এছাড়াও ভিন্নভিন্ন পদ্ধতিতে সাহায্যেও হাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। জেলা শহরগুলোতে চালের দাম বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তান এর অন্তর্গত।

নাটকটি যে বাস্তবতার পরত দ্বারা ঘেরা তার প্রমাণ আরেকভাবে নাট্যকার দিয়েছেন। নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে মাইলফলকে পূর্ব পাকিস্তানের জেলাগুলোর নাম উল্লেখ করেছেন। ফলকগুলোতে লেখা রয়েছে, চাঁদপুর, শান্তিপুর, আহম্মদগঞ্জ, পটুয়াখালী ইত্যাদি জায়গার নাম। উল্লেখ্য চাঁদপুর, পটুয়াখালী ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণদিকে হলেও শান্তিপুর, আহম্মদগঞ্জ নামদুটো দিয়ে দিয়ে বাস্তবতার সাথে অ্যাবসার্ডেও সমন্বয় করেছেন নাট্যকার। চৌকিদার অত্যন্ত গোপণে চাঁদপুর, পটুয়াখালীর নাম উচ্চারণ করে। চৌকিদার অর্থহীনভাবে জীবনের অর্থহীনতার কথা বলতে থাকে। রাত্রির নির্জনতায় ডাকতে থাকে লক্ষ কোটি বাঙালিকে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একত্রে অথবা পূর্ব পাকিস্তানের অদিবাসীদের সর্বজনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আদতে এক অলীক স্বপ্ন। শান্তিপুর অথবা সোনার বাংলা মুক্তির প্রতিশ্রুত স্বর্গোদ্যান। যা একইসাথে অথৃহীন, অসঙ্গতিপূর্ণ দুর্ভিক্ষে কবলিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে বাঙালি এর আগে যে দুর্ভিক্ষকে মোকাবিলা করেছিলো, তাতে মোট জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রাণ হারায় পঞ্চাশ লক্ষ। ফরিদপুরের এক কমিউনিস্ট পার্টিও কর্মীর চিঠি থেকে সৈয়দ জামিল আহমেদ এভাবে তুলে ধরেছেন-

> এখানে, গোঁসাইয়ের হাট সংলগ্ন বাজারে, একটি অনশনক্লিষ্ট ছেলে কয়েকদিন ধরে পড়ে ছিল্ অনাহারে সে নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। রাত্রে একটা খেঁকশিয়াল এসে তার ডান পায়ের পাতার অর্ধেকটা খাবলে নিয়ে চলে যায়। সে আরও কয়েকদিন অর্ধমৃত অবস্থায় ওখানেই পড়ে থাকে। কেউ তাকে সরায় না। গত রাত্রে খেঁকশিয়াল আবার হানা দিয়ে তার হাত, পা, নাড়িভুঁড়ি, সব খেয়ে চলে যায়। তার ক্ষীণ আর্তনাদ কারো কানে পেপৌছায়নি। যারা পরদিন সকাল সকাল বাজারে আসে, তারাই সেই অর্ধভক্ষিত শবদেহ দেখতে পায়।[১৭]

১৯৪৩ সালের প্রথমদিকের কয়েক মাস প্রদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে চরম দুর্দশার রিপোর্ট আসতে থাকে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে দুর্ভিক্ষ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। মৃত্যুহার লক্ষ্যণীয় হারে বেড়ে যায়। জুলাই মাস নাগাদ প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা দুর্ভিক্ষকবলিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুহার স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এরমধ্যে কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করলে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে সরকারের পক্ষে মনোযোগ প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্ষুধা, মহামারি, অর্থনৈতিক দুর্দশা জনজীবনকে ব্যাপকভাবে ব্যহত করে। জনতার প্রচণ্ড চাপের মুখে ভারতীয় সরকার যে তদন্ত কমিশন গঠন করে, তাতে মন্ত্রিবর্গ ও খাদ্য বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আমলাদের নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহের পুরো ধারাবাহিকতাকেঅবষ্থার অবনতির জন্য দায়ী করা হয়।

> গোরখোদক : অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ..লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে গিলে ফেলেছে সে। ..গ্রামের পথে আজ আর কেউ হাঁটে না।.. দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।..ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে তার গতি।[১৮]

'৪৩-এর মন্বন্তর যে মনুষ্যসৃষ্ট ছিলো, তার প্রমাণ হিসেবে সৈয়দ জামিল আহমেদ গীনোর রিপোর্ট থেকে দেখিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও মজুতদারেরা ৯০% ধান ও চাল মজুত করে রাখে। ***মাইলপোস্ট*** নাটকের প্রতিটি শিরায় নিহিত আছে বাস্তবতার ভীতিপূর্ণ অর্থহীন মনুষ্যসৃষ্ট কার্যাবলী, যা সামাজিক এবং নৈতিকদিক থেকেও অসঙ্গত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গোরখোদক এই দুর্ভিক্ষের সময়ে মরা মানুষের হাড়ের ব্যবসায় লিপ্ত। দুর্ভিক্ষের বাস্তবতায় যারা নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির কাজে লিপ্ত থাকে; স্পষ্ট বয়ানে যারা মজুত ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে দুর্ভিক্ষকে উস্কে দিয়েছিলো নাট্যকার সাঈদের গোরখোদক তাদেরই প্রতিনিধি।

গোরখোদক : দুর্ভিক্ষ এসেছে আশীর্বাদের মতো, প্রচুর ফসল ওঠাতে হবে এখন ঘরে।[১৯]

কিংবা সে বলে ওঠে-

গোরখোদক : ভুল, বন্ধু ভুল, কেবল আমার ব্যবসাটাই তো আজকাল বেশ জেঁকে বসেছে।[২০]

সে নিজের কৃতকর্মের সমর্থনে আরও বলে-

গোরখোদক :..এবার সারা দুনিয়াটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুম দিতে পারবো।[২১]

মাইলপোস্ট নাটকের প্রথম মঞ্চায়নে দর্শকের হৃদয়ে '৪৩ এর চেয়েও '৫৬ সালের খাদ্য সংকট অধিকতর প্রকট আকারে ঝাঁকুনি দেয়। ১৯৫৬ সালের পত্রিকার রিপোর্টে দেখা যায়,খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও মন্ত্রিসভা শোচনীয় ব্যর্থতা ও চরম কেলেংকারীর পরিচয় দিয়েছে। ৪ জুলাই ১৯৫৬ তে আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলে। ৭ জুলাই খাদ্যদাবি দিবস পালনে সরকার বাঁধা সৃষ্টি করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ৮ জুলাই শোক ও সভার আয়োজন করা হয়। ১০ জুলাই শেখ মুজিব বাংলায় খাদ্য সংকটের পরিস্থিতি সোহরাওয়ার্দীকে অবহিত করার জন্য করাচী যান। ১২ জুলাই তিনি তাঁর রাজনৈতিক নেতা সোহরাওয়ার্দীর সাথে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন। মূলত, ১৯৬৫ সালে মঞ্চায়িত মাইলপোস্ট '৪৩ এর চেয়ে '৫৬ নিকটবর্তী হবার কারণে দর্শক তেতাল্লিশের মন্বন্তরের দুর্দশাকে খুব ভালো করেই অনুধাবন করতে পেরেছিলো। ইতিহাস কিংবা বাস্তবতা ***মাইলপোস্ট*** নাটকের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি শব্দে নিহিত আছে।

ডাকপিয়ন : তাহলে বাঁচার কোন উপায় নেই ?
গোরখোদক : লাখে একজনও বাঁচবে না।[২২]

ডাকপিয়ন চিঠি বিলি করার উদ্দেশ্যে বের হলেও প্রাপকের একজনকেও জীবিত পায়নি। আক্ষেপের সাথে সে বলে ওঠে-

ডাকপিয়ন : বিশ্বাস করো। চিঠির প্রাপকদের একজনকেও আমি জীবিত পাইনি। সুন্দর নামগুলো হাটের লিস্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[২৩]

১৯৫৬ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে আবুল হোসেন সরকার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিলো। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সরকার বার্মা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ থেকে জরুরি ভিত্তিতে চাল, গম ক্রয় করেছিলো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিমানযোগে খাদ্য পৌঁছানো হয়োছিলো। লক্ষ টাকা ব্যয়ে রিলিফ কর্মসূচি নিয়ে জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করা হয়। এই বিশাল কর্মজ্ঞ সত্ত্বেও '৫৮ সালে আবার বাংলার মানুষ প্রাণ হারায়।

চৌকিদার : সত্যি করে বল দেখি এটা কি নতুন দুর্ভিক্ষ ? নাকি পুরানোটাই ঘুরে ঘুরে আসছে।[২৪]

চৌকিদার যেন তৃতীয় অঙ্কে প্রথম অঙ্কে নিজের কথার উত্তর দেয়-

চৌকিদার : এ দুর্ভিক্ষ কখনও আমাদের ছাড়বে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে সে তার উল্লাসময় জয়যাত্রা শুরু করেছে। সে লুকিয়ে থাকে, জড় অবস্থায় কালাতিপাত করে, ভূগর্ভে বিচরণ করে নিজের খুশিমতো।[২৫]

দুর্ভিক্ষ ঘুরে ঘুরে আসে তার প্রমাণ ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশবাসী আবারও এই ভয়াল রাক্ষসের আক্রমণের স্বীকার হয়। '৭৪ এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশবাসী এটি প্রত্যক্ষ করে। সরকারি হিসাবে ২৭০০০ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। বেসরকারি হিসেবে ১,০০,০০০ থেকে ৪,৫০,০০০ জন। কারণ হিসেবে জনসংখ্যা, চোরাচালান, খাদ্য মজুদে অব্যবস্থাপনাদুর্নীতি প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা যায়। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষকে চৌকিদার বলতে থাকে-

চৌকিদার : লুকিয়ে থাকে.. আমাদের আশা জাগে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ড্রাগন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আছড়ে দেয়.. দৈবাৎ যারা বেঁচে যায়তারা লেগে যায় নীড় বাঁধার চেষ্টায়। .. দেহমন প্রতিমুহূর্তে আতঙ্কিত।[২৬]

মানুষের রাক্ষুসে ক্ষুধার ফলাফল দুর্ভিক্ষ। যা নাট্যের প্রতিটি স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এর সাথে আছে বন্যা আর মহামারি।

গোরখোদক : সে কি বিচ্ছিরি বৃষ্টি। .. পৃথিবীতে আরও হাজারো জায়গা আছে। .. এখানে কেন এই বিশ্রী কাণ্ড।
চৌকিদার : ওটা নিশ্চই বর্ষাকাল ছিল।
গোরখোদক : কিন্তু এখানে কেন ?.. বর্ষাকালটা সুখের হতে পারে না ? [২৭]

মাইলপোস্ট নাটকটি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের চিত্রকে যে প্রতিটা পরতে আঁকড়ে ধরে আছে, তা আরও চিশ্চিত হওয়া যায় ; যখন দেখা যায় চৌকিদার আর সঙ চরিত্র দুটোও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করেছেন নাট্যকার। এযেন, অ্যাবসার্ড ভূবনে পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতার এক নির্বাচিত ও পুনর্বিন্যস্ত রূপ। চৌকিদার চরিত্রটি যেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে, তেমনি সঙ চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার খাজা নাজিমুদ্দিনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সঙ দাবি করে-

সঙ : .. আমি মহাশূন্যে নাচতে পারি, দরিয়ায় নাচতে পারি, অগ্নিবলয়ে নাচতে পারি। আমি মুহূর্তের মধ্যে পাখি হয়ে দিগন্তে উড়ে যেতে পারি। আমি অনেক উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আবার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দুশো মাইল দৌড়াতে পারি। .. কিন্তু আমি কিছুই করবো না। কারণ আমি শোক পালন করছি।[২৮]

খাজা নাজিমুদ্দিন ভারতীয় ঔপনিবেশিক প্রজা হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি যখন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রি (১৫ আগস্ট ১৯৪৭-১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) রূপে আবির্ভূত হন, তখনই তাঁর সঙের ন্যায়ে রূপান্তর ঘটেছিলো। স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকা থেকে বিমানযোগে উড়াল দিয়ে করাচি পৌঁছে পাকিস্তানের গভর্নও জেনারেল পদ গ্রহণ করেন (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮- ১৭ অক্টোবর ১৯৫১)। আবার সেই সুউচ্চ পদ থেকে ঝাঁপিয়ে প্রধানমন্ত্রির পদে আসীন হন (১৭ অক্টোবর ১৯৫১-১৭ এপ্রিল ১৯৫৩)। অবশেষে ১৯৫৩ সালে দেশব্যপী তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে বরখাস্ত করেন। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলে তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে কর্পূরের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে যান। অকার্যকর, ভীরু, দুর্বলচিত্তের মানুষ খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় রেখেছিলেন। তৎকালীন সরকার তাকে পাকিস্তানের ইতিহাসের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁকে লোহার খাঁচায় ক্ষুধার্ত বাঘকে যেমন সার্কাসের মালিক প্রেরণ করে, তেমনি নিয়োগ দিয়েছিলো। ১৯৪৮ সালের সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি যখন মূখ্যমন্ত্রির দায়িত্বে নিয়োজিত তখন তাকে সামাল দিতে হয়েছিলো পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার আন্দোলন। ছাত্র বিক্ষোভ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তকন সার্কাসের ড্রামেল উত্তাল বাদনের সাথে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। উপায় না দেখে তিনি আপোষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজে শিক্ষার মাধ্রম হিসেবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি বিধান সভায় তোলেন। যদিও মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ সমগ্র বিষয়টি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে করা হয়েছে এই অযুহাতে পুরো বিষয়টি মানকে অস্বীকার করেন। স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় সঙে রূপান্তরিত হন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ খাজাকে বারবার বাঘের খাঁচায় ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিলো। ১৯৫২ সালে তিনি যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগী রুহুল আমিন পূর্ববঙ্গের মূখ্যমন্ত্রি, তখন ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকা শহর প্রজ্জ্বলিত হয়। পুলিশের গুলিতে অন্তত চারজন শহীন হন। শহরের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় ও মন্ত্রিরা ব্যারাকে গিয়ে আশ্রয়

নেয়। শেষাবধি সেরাবাহিনীর হস্তক্ষেপে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানি-সুন্নি দাঙ্গায় আবার সেনাবাহিনীর তলব পড়ে। একই বছর সিআইএ কর্তৃক দুর্ভিক্ষের গুজব প্রচারের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃস্টি হলে নিরূপায় হয়ে পড়ে খাজা নাজিমুদ্দিন সরকার। ১৯৫৩ সালে যখন কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি ওঠে, তখন খাজা নাজিমুদ্দিন-এর বিরোধিতা করেন। তখন ফিরোজ খান নুনকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিয়োগ দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তখন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ খাজা নাজিমুদ্দিনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বলেন। খাজা নাজিমুদ্দিন তা অস্বীকার করলে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তার সংরক্ষিত ক্ষমতাবলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এরপর সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বগুড়া নতুন প্রধানমন্ত্রীহন।

সৈয়দ জামিল আহমেদ নাটকটিকে বেকেটীয় ধমনী থেকে আসা অ্যাবসার্ড ভীষন বলেছেন, আবার তিনি বলেছেন, নাটকটি '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে ভূল রূপায়ণ। এই '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে ভূল রূপায়ণ শব্দটির অর্থ অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে নাট্যকার সাঈদ আহমদ দেখিয়েছেন মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ কীভাবে মানুষকে ভোগায়, আর এই দুর্যোগ চক্রাকারে ঘুরে ফিরে আসে। তাই নাটকটিকে কেবল কালের রূপায়ন বললে ভুল হবে। থিয়েটার স্থানের নির্দিষ্টতায় কালের মাত্রায় নির্মিত হয়। অর্থাৎ একজন নাট্যকার চাইলেই একইসাথে অনেক স্থান ও কালের ট্রিটমেন্ট করতে পারেননা। এতে যেমন প্লটের গঠন শিথিল হয়ে যায়, তেমনি দর্শক / পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতাও হারায়। আর নাটকের প্লট যদি বাস্তবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়, তবে নাট্যকারকে বাস্তবের প্রতি অনুগত হতে হয়। এক্ষেত্রে নাট্যকার শৈলীর মাধ্যমে নাটকের আঙ্গিকগত পরিবর্তন আনতে পারেন, যেমনটা নাট্যকার সাঈদ করেছেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের শোষণের চিত্র বেকেটীয় অ্যাবসার্ড ভিষনের মাধ্যমে করেছেন। তবে, এদেশিয় প্লটের গঠন কাঠামোতে তিনি খুব বেশি বেকেটের প্রতি অনুগত থাকতে পারেননি। কারণ অ্যাসার্ডের বেসুরো ঘটনার চাপ বাঙালি নিতে অক্ষম। যেভাবে বাঙালির সংস্কৃতিতে ট্র্যাজেডি নেই, তেমনি অ্যাবসার্ডও নেই। নাট্যকার সাঈদ আহমদের চোখে পাকিস্তানি সরকারের যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিলো, তা তিনি অ্যাবসার্ডের ওপর ভর করে এদেশীয় পদ্ধতিতে শৈল্পিক সমাধান করেছেন। আবার এদেশীয় পদ্ধতি বলতে লোকনাটকের আঙ্গিকও নয়। কেন তাঁর নাটককে লোকনাটক বলা যাবে না, এই প্রশ্নের তালাশে লোকনাটকের আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলে, প্রশ্নের সমাধান করা সহজ হবে।

যেকোন ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সামনের ক্রিয়া উপস্থাপন হচ্ছে নাটক। এখানে ক্রিয়া কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্রিয়া হতে পারে মৌখিকভাবে রচিত, হতে পারে লিখিত। লিখিত ক্রিয়া পূর্ব নির্ধারিত হওয়াতে তা লিখিত রূপ দেন নাট্যকার। পাণিনি নাট্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নাট্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নটের কর্ম'[২৯]। একালের ক্রিয়াকে অতীতে নটের কর্ম বলা হত। অন্যদিকে পতঞ্জলি নট বলতে যে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো, এমন শ্রেণিকে বুঝিয়েছেন। ড. সুনীতি কুমার সংস্কৃত শব্দ থেকে এসকল শব্দের বাংলায় আগমন বলে মনে করেন। নাটক নাগরিক জীবনে যেমনটি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো, তেমনি গ্রামীণ জীবনেও। গ্রামীণ সমাজের জনসাধারণের মুখে মুখে যে ধরনের নাটক রচিত হয় তাকে লোকনাটকের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। সাধারণত এদেশীয় কৃত্য ও রুচির অনুকূলে লোকনাটক রচিত হয়। তাই লোকনাটককে লোকসাহিত্যের অধ্যায় নয় বরং একে দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করে সমাজে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। কেননা জাতীয়নাট্য পরিবেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি সকল কুশীলবগণের মাধ্যমে সমাজে বিকশিত হয়। এই ফর্মের স্রষ্টা সাধারণ খেটে খাওয়া লোকজন। এরাই এটি পরিবেশনার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায়। দর্শক এই পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দর্শকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ একে এক

বাঁক থেকে অন্য বাঁকে নিয়ে যায়। তবে এর কোন লিখিত রূপ নেই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। বাংলায় রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, অষ্টক গান, কুশান গান লোক কুশীলবগলেন মাধ্যমে যেমন পরিবেশিত হয়ে আসছে ; তেমনি এর লিখিত রূপও পাওয়া যায়। তাই সকল পরিবেশনাকে লোক নাট্যের পর্যায়ভুক্ত করলে বিজ্ঞজনের মাঝে সন্দেহ থেকে যায়। লোকনাট্য মূলত দ্বৈতাদ্বৈতা শিল্প, যা আঙ্গিক নির্ভর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখে মুখে পরিবেশনাটি গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হবার ফলে এতে মূল কাহিনির সাথে সাথে শাখা কাহিনি যুক্ত হয়ে যায়। আবার লিখিত পাণ্ডুলিপি থাকলেও বহু মানুষের হাত ঘুরে এর পরিবেশনা চলায় মৌলিকত্ব থাকে না। এই কারণে মনসাকে সিনেমার খল নায়িকা মনে হয়, বিশ্বকর্মা ফ্লাইওভারের ওপরদিয়ে হাঁটে। আলোচ্য লোকনাট্যের কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে নাট্যকার সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট* নাটকের আঙ্গিকগত মিল নেই। তাই এদেশীয় নাটক বলতে যে নাট্যকার সাঈদ আহমদের নাটককে লোকনাট্যের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে, ধারণাটি অবান্তর। আবার প্রফেসর জামিল আহমেদ একে বেকেটীয় ধমনী থেকে আসা বলেছেন। অর্থাৎ অ্যাবসার্ড তত্ত্বটিকেও *মাইলপোস্ট* পুরোটা সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে নাট্যকার সাঈদের *মাইলপোস্ট* এর প্লটের গঠন সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নাট্যকটিতে শেষাবধি বাংলার মা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে কিনা এই দ্বিধায় ভোগে, তাই নিম্নবর্গ এই নাটকের অত্যাবশ্যকীয় অংশ। অন্যদিকে যেহেতু নাট্যকার সাঈদ অ্যাবসার্ডের চেয়েও আধুনিক বিষয়কে শৈলী হিসেবে *মাইলপোস্ট* নাটকটির আঙ্গিক সাজিয়েছেন, তাই তাঁর নাটক যে তথাকথিত কাঠামোবাদ থেকে সরে এসেছে, অর্থাৎ ইবসেনীয় রীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে কিনা তাও তদন্তযোগ্য বিষয়।

উল্লেখ্য নাট্যকার সাঈদ আহমদ দুর্ভিক্ষের মতো নন-পারফরমেটিভ উপাদানকে নাটকের কেন্দ্রে রেখেছেন, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে নাটকটির কেন্দ্রিয় চরিত্র। তিনি তাঁর প্রথম নাটক কালবেলা' তেও থিয়েটারের দুনিয়ায় একই ট্রিটমেন্ট করেছেন। দুর্ভিক্ষ নিজে জড় উপাদান, যা আরোপিত হয়েছে নিম্নবর্গের ওপর ; যারা দুর্ভিক্ষকে শক্ত হাতে দমনে সক্ষম নয়। দুর্ভিক্ষ এমন একটি বিষয় যা সরাসরি মানুষের প্রথম মৌলিক উপাদানের সাথে জড়িত। তাই দুর্ভিক্ষ সরাসরি মানুষকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। এর সক্ষমতার বিষয়ে নাটক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে। অতীত ইতিহাসকে সহজবোধ্য উপায়ে দর্শক/পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার মাধ্যম হিসেবে নাট্যকার সাঈদ *মাইলপোস্ট* নাটককে বেছে নিয়েছেন। উচ্চমৃত্যুহার পরাধীন দেশে খাদ্য ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার মতো বিষয় হুমকির মধ্যদিয়ে যাচ্ছিলো। এতে করে সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। বৈষম্যের বিষয়টিকে কিম্বার্লে ক্রিনশো-এর প্রবর্তিত তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এতে জাতি, লিঙ্গ, আর্থসামাজিক অবস্থা জটিল প্রভাব অনুধাবনে করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতিগতদিক থেকে যারাই পৃথিবীতে সংখ্যালঘু তারা সামাজিক সেবাসমূহে সীমিত প্রবেশাধিকার পায়, উচ্চতর ঝুঁকিতে পড়ে, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। শ্রেণি বৈষম্যের ফলে পূর্ব বাংলায় নিম্নবর্গ শ্রেণি মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়েছিলো। অবশ্যই এটি ক্যাথারসিসের উদ্রেক করেছিলো, ফলে এদেশবাসীর অধিকাংশ একধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে একজন সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে নাট্যকার সাঈদ বিষয়টির অবতারনা করেছেন। সংস্কৃতি অধ্যয়নে গবেষকগণ সাধারণত তদন্ত করে থাকেন সংস্কৃতি কীরূপে সামাজিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এটি মূলত মার্ক্সবাদী শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিলো। এতে সেমিওটিক্স, মার্ক্সবাদ, নারীবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদ, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মিডিয়াতত্ত্ব, চলচ্চিত্রবিদ্যা,রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। মার্ক্সবাদ এই অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গবেষণায় প্রথমত আন্তোনিও গ্রামসি'র তত্ত্বকে অনুসরণ করা হবে। রেপ্রিজেন্টেশন তত্ত্ব, উত্তর আধুনিকতাবাদও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গ্রামসির আধিপত্য তত্ত্ব অনুযায়ী পুরাতন শৈলী যে নির্দিষ্ট শ্রেণিকে প্রভাবিত করেছে তার বিপরীতে শোষণের বিষয়টিকে নিয়ে থিয়েট্রিক্যাল

সিস্টেমে অনেক বেশি স্বাধীনচেতামূলক করেছেন নাট্যকার। যেহেতু গ্রামসি বস্তুবাদী ধারণার সাথে একমত পোষণ করেননি, তাই তিনি মনে করতেন মানুষ পরিচালিত হয় আইডিয়া দ্বারা, বস্তু দ্বারা নয়। এই আইডিয়াই হচ্ছে জীবনের পুনরুৎপাদন এবং ইতিহাসের চূড়ান্ত নির্ধারক। তাঁর পুনরুৎপাদন চিন্তা মূলত, এক ধরণের আদর্শবাদ। পশ্চিমা চিন্তাধারা দ্বারা এদেশবাসী প্রভাবিত হলেও ধরে নেওয়া হয় ইউরোপীয়রাই প্রথম এনলাইটেনমেন্টের সাথে সমগ্র বিশ্ববাসীকে পরিচয় করিয়েছিলো। এনলাইটেনমেন্ট এর সময় থেকেই মানুষ প্রকৃতির সাথে মিশে থাকবে না বরং প্রভুত্ব আরোপ করবে, এমন ধারণা পোষণ করা হতো। যা কিছু ঐতিহ্য থেকে অগত তার থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে হবে, মুক্তি পেতে হবে, এটি ছিলো এনলাইটেনমেন্টের মূল কথা। নতুন একটা দিকের দিকে যাত্রার দিকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়। এগুলো এনলাইটমেন্টের গুরুতর প্রকল্প। এখানে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের নাম অগ্রগণ্য। তারা দেখিয়েছেন প্রকৃতিকে সূত্রের মাঝে আবদ্ধ করার মাধ্যমে এর উপর কর্তৃত্বারোপ করা সম্ভব। প্রকৃতির বিধ্বংসীরূপের বিপরীতে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ দারুণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এতে মানুষ নিজেদের নির্দিষ্ট কাঠামোর মাঝে আবিষ্কার করে এবং আধুনিকতার সুফল ভোগ করে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণাটি রেনেসাঁসের সাথে তৎকালীন আধুনিকত্বের তুলনা করলে পাওয়া যাবে। যদিও এর আগেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বেও বিষয়টি ঘোষণা হয়ে গেছে। সূরা মুরছালাত, আয়াত ২২-২৩,এ বলা হয়েছে, 'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, এটিকে গঠন করেছি পরিমিত ভাবে'[৩০]। এনলাইটমেন্টে ইহলৌকিকতার জয়গান করা হয়েছে। মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) কান্টের এনলাইটমেন্টকে খারিজ সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। ফুকোর মতে, এনলাইটমেন্ট নিজেই নিজেকে ক্রিটিক করে, এর ফলে স্বেচ্ছাচারী যুক্তির গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব ও নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব । এনলাইটমেন্ট প্রক্রিয়া নিজেই মানবকেন্দ্রিক। মার্ক্স, সার্ত্রে, নিৎশের চিন্তাভাবনার লক্ষ্য ছিলো মানুষকে কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে কর্তৃত্বমুক্ত করা। তবে এটি বিচিত্রভাবে কখনো পরিবেশ, কখনো নারী এবং বাইরের অপরাপর মানুষের ওপর কর্তৃত্বারোপ করেছে। এই মতবাদের ফলে মানবতাবাদের জন্ম। ফার্ডিনান্দ দ্য সোস্যুরও (১৮৫৭-১৯১৩) কাঠামোবাদের কথা বলেন। তিনি দেখিয়েছেন আমি পারিনা, তুমি পারো না কিন্তু আমরা পারি। কাঠামোবাদের এ সকল ধারণার বিপরীতে ফুকো কনফেজের কথা বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুক্তি আসে। এই স্বীকারোক্তি ঈশ্বর বা ধর্মের কাছে নয় বরং জীবনের অধিকারভুক্ত ক্ষমতার কাছে। তাঁর তত্ত্বে যৌনতা অবদমিত নয়, এর অবস্থান সর্বত্র। বর্তমান বায়োপাওয়ার এটাকে ঘিরে। তাই এটা রিপ্রেইসড হতে পারে না। দেরিদাও কাঠামোবাদের দুর্বলতাকে তুলে ধরে বিনির্মাণের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শব্দের নির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই কিন্তু সেই শব্দের কাছাকাছি সমার্থক শব্দ আছে। যেহেতু গবেষণাটি নাট্যকলা সংক্রান্ত জ্ঞান উৎপাদনকে ঘিরে তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে ভিক্টর টার্নার (১৯২০-১৯৮৩) ও রিচার্ড শেখনার (১৯৩৪) গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা দুজনই দেখিয়েছেন সমাজের প্রতিটি কার্যকলাপ কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন থেকে তারা দুজনই দেখিয়েছেন পারফরমেন্স কিভাবে মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পারফরমেন্স থিওরি অনুযায়ী সমাজের প্রতিটা মানুষ পারফরমেন্সের ভেতর দিয়ে দিন অতিবাহিত করে। 'Whether through the clothes we wear, the conversations we hold or the food we eat, all are a performance designed as a signal – system to ourselves and to others of our place within our social group'[৩১] । অন্যদিকে জুডিথ বাটলার (১৯৫৬) ও জ্যাক দেরিদাও (১৯৩০-২০০৪) সমাজে ব্যক্তি পরিচয়কে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন।

> signal – system When an individual plays a part he implicitly requests his observes to take seriously the impression that is festered before them . They are asked to believe that the character they see actually possesses the attributes he appears to possess, that the task

> he performs will have the consequences that are implicitly claimed for it and that in general, matters are what they appear to be[৩২]।

প্রকৃতপক্ষে পারফরমেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি যুগে পারফরমেন্সের ধারণা সমাজে প্রক্রিয়া রাখতে সক্ষম হয়েছে ও সমাজকে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দেয়। 'This is also made possible by a related area of study which is termed `performativity '[৩৩]। এটি এমন একটি ডিসকোর্স যা পারফরমেন্সের আইন প্রণয়নে সহায়তা করে। বাটলার মূলত কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে শব্দ ও ভাষার ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছে। মানুষের ব্যক্তি জগতে ভাষার রয়েছে প্রচুর দখল। বিষয়টি বিচিত্র মনে হলেও এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি স্টেটমেন্ট, যা কেবল বাটলার নয় বরং ফ্রয়েড ও লাঁকাও স্বীকার করে গেছেন। আর শরীর ও মনের ভাষার মিশ্রণে যে অভিনয় সম্পন্ন হয়, তা পণ্ডিত মহলে সর্বজনস্বীকৃত। যেহেতু থিয়েটারের নব্যশৈলী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাচীন নিয়মের বিরূদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করে যেতে হবে তাই জ্ঞান তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তালাশে লিপ্ত হবে গবেষক। প্রস্তাবিত নাট্যকার সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটকটির শৈলীটি থিয়েটার শিল্পের জন্য নব্য তাই নির্মাণ কিংবা বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে অগ্রসরমাণ হবে গবেষক। একইসাথে নাটক যেহেতু জীবনের কথা বলে, সমাজকে নিয়ে, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয় তাই সংস্কৃতি তো বটে একইসাথে ভাষা কাঠামো প্রবন্ধে নিহিত থাকবে।

স্পষ্টতই, থিয়েটার প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীনকালে শিল্প ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিলো, তৈরি হয়েছিলো শিল্পশাস্ত্র। শিল্প বরাবরই উপভোগের ও সুন্দরের সাথে সম্পর্কিত। কিছুকাল আগে পর্যন্ত শিল্পের জন্য শিল্প কথাটি বেশ জনপ্রিয় ছিলো। ধারণাটির উৎপত্তি ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্সে। যদিও আর্ট ফর আর্ট সেক সমস্ত রাজনৈতিক এবং আদর্শিক উদ্বেগ থেকে সরে এসে হুইসলার শিল্পের মূল্যের ওপর জোর দিয়েছেন। বোদলেয়ার পূর্বে শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী থাকলেও পরবর্তীতে নিজের পুরোনো বিশ্বাস থেকে সরে এসেছেন। তিনি এসময় ঘোষণা দেন শিল্পের সামাজিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। অর্থাৎ, শিল্পকে হতে হবে সমাজনিরপেক্ষ। কারণ শিল্প শুধু জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করে না, এটি জীবনকে ব্যাখ্যাও করে। বলিনস্কি মনে করতেন, জনকল্যাণের উপায় হলো জনচেতনা আর চেতনা উন্নয়নে বিজ্ঞানের চেয়ে শিল্প কম যায় না। টলস্টয় খুব জোরের সাথে শিল্পের জন্য শিল্পতত্ত্বটির বিরোধিতা করেছিলেন। ইবসেন, বার্নাড শ' তাঁরা কেউ তত্ত্বটির সমর্থন করেন নি। ফরাসী গণনাট্যের পথিকৃৎ রঁম্য রঁলা সর্বসাধারণের কাছে নাটককে পৌঁছে দিতে তত্ত্বটির সমর্থন করেননি। ইবসেনের নাটকে সমাজ সত্যের প্রতিফলন ছিলো বলেই দর্শক তা সাদরে গ্রহণ করেছিলো। নাট্যকার সাঈদের ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণামূলক নাটকটি খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, বর্হিবাণিজ্য, নিরাপত্তা, শোষণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীবাসী কোন অবস্থাতেই কোনদিনই বন্দীদশাকে মেনেনি। প্রাণীকূলের অবস্থানও এর বিপক্ষে। নজরুল তাঁর সংগ্রামী গানের ভাষায় বলেছেন,

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ! ধ্বংস-নিষান
উঠুক প্রচীর প্রচীর ভেদ!!
গাজনের বাজনা বাজা!

কে মালিক? কে সে রাজা? কে দেয় সাজা
মুক্ত- স্বাধীন সত্য কে রে?[৩৪]

রিচার্ড শেখনার (১৯৩৪)-এর পারফরমেন্স তত্ত্ব মতে, পারফরমেন্স অভিনেতার ব্যক্তিগত উপলব্ধি অনুসারে উপস্থাপিত হয়, যেখানে সাংস্কৃতিক নিদর্শন উপস্থাপিত হয়। আধুনিক অধিকাংশ অভিনেতা তাঁর তত্ত্বকে অনুসরণ করে। থিয়েটারের তত্ত্ব ও প্রযোজনা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি থিয়েটারকে মঞ্চের গণ্ডীর ভেতর আত্মীকরণের পক্ষপাতী নন, বরং তিনি মনে করেন, পারফরমেন্স প্রাত্যহিক জীবনের অনুসরণ ।

> It is important to develop and articulate theories concerning how performances a regenerated, transmitted, received and evaluated in pursuit of these goals, performance studies is insistently intercultural, inter-generic and inter-disciplinary[৩৫] ।

অন্যান্য সকল একাডেমিক কার্যক্রমের মতো, থিয়েটারও ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ, নিজেকে উপস্থাপন, সামাজিক আচার-আচরণের সাথে সম্পর্কিত্। থিয়েটার এর পরিবেশনাকারীগণ তাদের পরিবেশনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জনপ্রিয় সংস্কৃতি, লোককাহিনি ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে ক্রস ডিসিপ্লিনারি মিশ্রণে অন্তর্ভুক্ত করে পরীক্ষামূলক উপায়ে উপস্থাপন করতে পারে। তিনি পারফরমেটিভ শব্দটি গ্রহণ করেছেন জে. এল অস্টিনের ভাষাতত্ত্ব থেকে। পারফরমেটিভ ধারণাটি উত্তরাধুনিক ধারণার সাথে সম্পর্কিত। মূলত উত্তরাধুনিক দৃষ্টিকোণ থিয়েটারকে আলাদাভাবে দেখে না। বরং একে বস্তুগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ফেব্রিক হিসেবে আলোকপাত করে। এটি শক্তি ও জ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষাদান, যেকোন ধরনের বক্তৃতা, ধর্মীয় উপদেশ পারফরমেন্সের অন্তর্ভুক্ত। মহাবিশ্বের বাস্তবতায় শেখনার মনে করেন, Representational art of all kinds is based on the assumption that 'art' and 'life' are not only separate but of different orders of reality. Life is primary, art secondary[৩৬]. | পারফরমেন্স স্টাডিজে শেখনার দাবি করেন , মঞ্চে অভিনয় করা আর সামাজিক আচরণ অর্থ্যাৎ দৈনন্দিন আচরণ উভয়েই পারফরমেন্সের আওতায় পড়ে। বাস্তবিক জীবন এখন সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রনাধীন, কিংবা সর্বদা যে কেউ যে কারও ওপর নজরদারি করতে সক্ষম। এহেন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ রোল প্লে ভিন্ন কিছু হতে পারে না।

> *The concept of 'performing in everyday life' is a central aspect of performativity, as envisaged by Schechner.* 'Performativity is everywhere – in daily behavior , in the professions, on the internet and media, in the arts and in the language.[৩৭]

শেখনার স্ট্রিট থিয়েটার থেকেও তাঁর তত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তিনি মনে করেন কিছু নাটকের দৃশ্যসজ্জার জন্য মঞ্চের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু স্ট্রিট থিয়েটারের মতো থিয়েটার দৃশ্যসজ্জার আমূল পরিবর্তন না করেও উপস্থাপিত হতে পারে। মূলত, শেখনারের স্ট্রিট থিয়েটারের ধারণাটি এদেশীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যের উপস্থাপনারীতির সাথে মিলে যায়।

নাটক লেখার নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে এবং নির্দেশক অনেক সময় পরিবেশনার ক্ষেত্রে নাটকের অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকের রীতি নির্ধারণ করে থাকে। আধুনিক ধারণা ও তার প্রয়োগমতে মঞ্চে নাটকের রীতি পরিকল্পনার পশ্চাতে থাকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে মঞ্চ নিমার্ণের পেছনে থাকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। নাট্য প্রযোজনার নানা উপাদানে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নাটকের

রীতির বিষয়টি প্রযোজনার একটি অপরিহার্য ভিত্তি। দৃশ্যায়নই যেহেতু নাটকের অপরিহার্য ধর্ম তাই এটি উপস্থাপনের কোন দিকই অগ্রাহ্য করা যায় না।

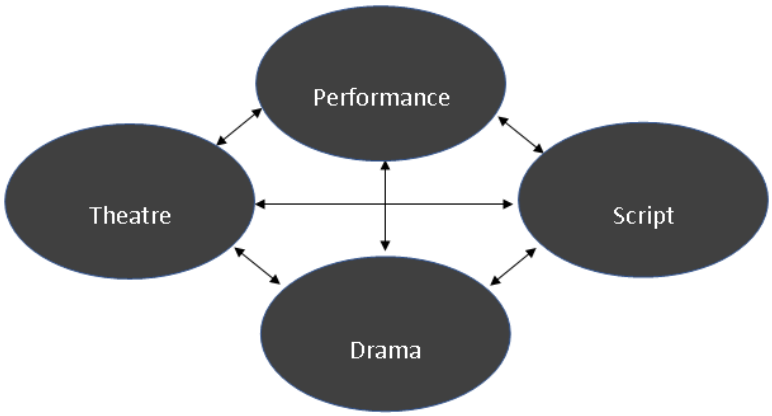

চিত্র : ৩

উপসংহার

নাট্যকার সাঈদের *মাইলপোস্ট* নাটকটি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশি মানুষের কল্যাণের তরে গড়ে উঠেছে, যার কেন্দ্রে মানুষ। পৃথিবীতে মানুষ এমন প্রাণী যে সংস্কৃতি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে। স্মর্তব্য, সংস্কৃতির ধারণাটি অনেক ব্যাপক। সংস্কৃতি আছে বলে মানুষ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়। ক্লদ লেভি ষ্ট্রস সংস্কৃতি বলতে কেবল বিশিষ্ট কর্মকাণ্ড বোঝেন না, 'বরং মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত সকল কর্মকাণ্ড বোঝেন'[৩৮] আর সমগ্র বিষয়টি গড়ে উঠেছে ভাষার মাধ্যমে। মানুষের ভাষার বিবর্তন ঘটেছিলো আড্ডার মাধ্যমে তাই হোমো স্যাপিয়েন্সের সামাজিক প্রাণী হিসেবে টিকে থাকাই কেবল মুখ্য নয়, বরং এর সাথে সদা পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিবর্তনের খবর রাখা তার মুখ্য দায়িত্ব। আড্ডা তত্ত্বটিবর্তমান গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মানুষ এই আড্ডার মাধ্যমে কোন এক সময়ে থিয়েটারের উদ্ভাবন করেছিলো। বর্তমানে থিয়েটারের যে প্রদর্শনী তাতেও দেখা যায়, কিছু মানুষ নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয় ও সেখানে ক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। মূলত, আড্ডাবাজ, গুজব রটনাকারীরাই আসলে প্রাথমিক স্যাপিয়েন্স সমাজের 'ফোর্থ এস্টেট', অর্থাৎ সাংবাদিক, যারা ভণ্ড আর সুবিধাভোগীদের সম্পর্কে সমাজে অবহিত করার এবং কিছুটা সুরক্ষিত করার চেষ্টাও করে'[৩৯]। মানুষের জীবনে থিয়েটার হচ্ছে এমন ক্রিয়াকলাপ, যার মাধ্যমে তার চেতনা জাগ্রত হয় ও সে সমাজ ও প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তথা পৃথিবীর আরও নিকটবর্তী হতে সক্ষম হতে পারে। যেহেতু থিয়েটারের মাধ্যমে কলাকুশলীগণ সামাজিক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন, তাই একে সামাজিক শক্তির প্রক্রিয়ার অংশ বললে অত্যুক্তি হবে না। থিয়েটার জ্ঞানকে বশীভূত করে সত্য উৎপাদন করে। ক্ষমতা ততক্ষণ কাজ করে না, যতক্ষণ তাতে জ্ঞান প্রয়োগ না হবে। এভাবেই গ্রহণযোগ্য বিতর্কের সীমানার মধ্যে থেকে সামাজিক ক্ষমতার অনুশীলন থিয়েটারের মাধ্যমে কীরূপে করা যায়, সেই তালাশ করে গেছে নাট্যকার সাঈদ আহমদ। মানুষ কখনও ক্ষমতা ও স্বাধীনতা এই দুইকে অস্বীকার করতে পারে না। ক্ষমতা হচ্ছে ইচ্ছার পুনর্বিবেচনা আর স্বাধীনতা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি। তাই শক্তি ও জ্ঞানকে সামাজিক যোগাযোগের ও সত্য উৎপাদনের মূল উপজীব্য করে থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসকে অব্যাহত রাখা জরুরি। থিয়েটারের আছে ভাষা, নৈতিকতা, নান্দনিকতা, সংস্কৃতি। আর এর মাঝেই টিকে থাকে সমাজ হাজার বছর। থিয়েটারের টিকে থাকার

লড়াইয়ে তাই দেশীয় ঐতিহ্যকে প্রধান্য দিয়ে, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার সহায়তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। শিল্পে পুনরুৎপাদন ক্ষতিকর নয়। ওস্তাদের কাজের নকল সকল সময়েই শিষ্যরা করে এসেছে। এক্ষেত্রে কেবল অরা কিংবা মাহাত্ম সংক্রান্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। নাট্যকার সাঈদের অ্যাবসার্ড রীতির অনুসরণ এদেশিয় সংস্কৃতিতে আধিপত্য তৈরি করতে পারে। যেহেতু এটি এদেশিয় শৈলী নয়, সেহেতু হেজিমনি আধিপত্য বা সার্বভৌম শাসককে নির্দেশ করে। তাই মতাদর্শ ও নিয়ন্ত্রণের পরস্পরের ধারণাগুলোকে একত্রিত করে থিয়েটারকে ক্ষমতার কেন্দ্রে মনোনিবেশ করা জরুরি। আধিপত্য তৈরি হবার কারণে সমাজে স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপন করা জরুরি, যা বাঙালি পাঠক বা দর্শক মেনে নিতে সক্ষম। তাই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার লড়াইয়ে থিয়েটারের রীতিতে পরিবর্তন আনা জরুরি। যা নাট্যকার সাঈদ সিদ্ধহস্তে সম্পাদন করেছেন। তাঁর রীতিটিকে তাই দেশাত্মবোধক ট্রিটমেন্ট বললে অত্যুক্তি হবেনা।

তথ্যসূত্র

১. হাসনাত আবদুল হাই (সম্পা.), *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, খণ্ড ১, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই ১৯৭৬), ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২. আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৭), পৃ. ৬৯।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।
৮. শাহমান মৈশান, "সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়", *থিয়েটার ওয়ালা*, সংখ্যা ৩০ (২০১৭)। https://www.theatrewala.net/.
৯. সাঈদ আহমদ, *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুলাই ১৯৭৬), পৃ. ৮১।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
১৩. সৈয়দ জামিল আহমেদ, "ক্ষ্যাপা", *অ্যাবসার্ড যখন বাস্তবতার বহুধা পরত প্রবিষ্ট*, সংখ্যা ৭, বর্ষ ১০ (২০২৩), পৃ. ১৬।
১৪. সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।
১৭. *অ্যাবসার্ড যখন বাস্তবতার বহুধা পরত প্রবিষ্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
১৮. সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।
২৯. সাঈদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশে লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মে ২০১০), পৃ. ২।
৩০. নূরানী তাজভীদ কোরআন, (ঢাকা : মীনা বুক হাউজ), পৃ. ৯৩১।
৩১. Erving Goffiman , *The presentation of the self in everyday life* , (Philadelphia : Pennsylvania University Press , 1969), p.-28
৩২. Ibid, p.- 217
৩৩. Judith Butler, *Excitable Speech : the politics of the performative*, (London : Rutledge, 2001) , p.- 8.
৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলসমগ্র*, (ঢাকা : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়,২০২২), পৃ. ১২।
৩৫. Richard Schechner's Performance Theory, UKEssays, 2018, Richard Schechner's Performance Theory - UKEssays.com
৩৬. Ibid.
৩৭. Ibid.
৩৮. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *ক্লদ লেভিস্ত্রোস বিভিন্ন পাঠ*, (ঢাকা : অক্ষর প্রকাশনী,২০১৯), পৃ. ২০।
৩৯. ইয়ুভাল নোয়াহ হারাবি, *স্যাপিয়েন্স : মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, সৈয়দ ফায়েজ আহমেদ ও প্রত্যাশা প্রাচুর্য (অনু.), (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,২০২৩), পৃ. ২৭।